মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৪

সনদ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ

অন্ধকার মিলনায়তনে প্রদীপের মতো জ্বলে আছে যেনো এক টুকরো হাসিমুখ। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে আপনজনের স্মরণে কোন নারী কণ্ঠের আনমনা সুর। *আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে* রবীন্দ্র সংগীত সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ভেসে ওঠা ভিডিও চিত্রের সাথে কামালউদ্দিন নীলুর কবিতা– *কুনঠে যাও বাহে* যেনো এক দলছুট বন্ধুর জন্যে বিচ্ছেদ বেদনা ভর করে ওঠে আবৃত্তিকার আসাদুজ্জামান নূরের কণ্ঠে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ : সনদ ও পুরস্কার প্রদান' অনুষ্ঠানের শুরুতে গত ২৯ জুন শনিবার বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তন অনুরণিত হয় এক অদ্ভুত আবেশে।

ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী তাঁর সূচনা বক্তব্যে বলেন– 'সূচনা সংগীতে উচ্চারিত *অনন্ত জাগে* কথাটি আলী যাকেরের জন্য যথার্থ। কারণ আলী যাকের এমন একজন মানুষ, যিনি জীবনকে উদযাপন করে গেছেন। শুধু পাঠ্য পুস্তক পড়ে আলী যাকের হওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করার। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু গ্রন্থাগার খুব প্রতিকূল পরিবেশে নতুন প্রজন্মকে বই পড়ানোর কাজটি করে আসছে। আলী যাকেরের পরম্পরাকে নিশ্চিত করার জন্য বড় প্রয়োজন বই পড়ার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা। আজকে যারা বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে এখানে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২৩

গত ২৮ জুন ২০২৪ শুক্রবার বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রবর্তিত 'বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২৩' প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ওবায়েদুল হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জুরিবোর্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। প্রিন্ট মিডিয়ায় পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিকের নাম ঘোষণা ও শংসাবচন পাঠ করেন জুরিবোর্ডের সদস্য ফরিদুর রেজা সাগর। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিকের নাম ঘোষণা ও শংসাবচন পাঠ করেন জুরিবোর্ডের অন্যতম সদস্য এ এস এম সামছুল আরেফিন। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য

শেষের পৃষ্ঠায় দেখুন

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে অভিবাদন জানাই। অভিবাদন জানাই সিলেকশন কমিটি, জুরিবোর্ড সদস্য ও এর মূল আয়োজকদের। বিশেষ করে ৪৬টি গ্রন্থাগারের যে ৫৪৮ জন ছেলেমেয়ে এই গ্রন্থপাঠ উদ্যোগে অংশ নিয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তোমরাই আমাদের বড় প্রাপ্তি। তোমরাই গড়বে আলী যাকেরের স্বপ্নের বাংলাদেশ।' আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের সমন্বয়কারী ও দনিয়া পাঠাগারের সভাপতি শাহনেওয়াজ বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বই পড়ার যে নীরব বিপ্লব শুরু করেছে তার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আগামীতে আমরা এই গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ নিয়ে দেশব্যাপী আরও বেশি পাঠাগারের পাঠকদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবো এই আমাদের প্রত্যাশা।' এরপর সিলেকশন কমিটির পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন সাংবাদিক ঝর্ণা মনি।

স্কুল পর্যায়ে আহসান হাবীব রচিত *একাত্তরের রোজনামচা* গ্রন্থের পাঠপ্রতিক্রিয়ার জন্য সেরা দশ পাঠককে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

স্কুল পর্যায়ের পুরস্কার প্রদান শেষে জুরি বোর্ড সদস্য নিশাত মজুমদার বলেন, এই তিনটি বই যে ৫৪৮ জন শিক্ষার্থী পড়েছেন তারা প্রত্যেকেই বিজয়ী। আমি মনে করি, এই বই পড়তে গিয়ে কোন একটি শিশুর মনের মধ্যে যদি কোন একটা জায়গায় একটি লাইনও সংশ্লেষ হয়ে থাকে সেটিই আজকের এই আয়োজনের সফলতা। যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এপর্যায়ে মক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তিনজন ট্রাস্টি যাদেরকে আমরা হারিয়েছি– যাকের ভাই, রবিউল ভাই, তারিক ভাইকে আমরা স্মরণ করার চেষ্টা করি তিন ভাবে। তারা যে কাজ করে গেছেন, আমরা সেটাকে উদযাপন করতে চাই। সমাজে নানা ধরনের নেতিবাচকতা সুকৃতিগুলো গ্রাস করছে। এসমস্ত কিছুকে মোচন করার জন্য যে কর্মযজ্ঞ প্রয়োজন– সেখানে এই উদযাপনগুলো ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নবীন-নবীনাদের অন্তরে প্রথিত হবে এটাই তো আলী যাকের ভাইয়ের স্বপ্ন ছিল। তিনি না থাকলেও এই আলোক মশাল এক হাত থেকে অন্য হাতে পৌঁছে যাবে। এটাই আমাদের অব্যাহত জয়যাত্রা। আর এই জয়ের নায়ক হবে আজকের যারা নতুন প্রজন্মের নবীন-নবীনা।

এরপর কলেজ পর্যায়ে শেখ তসলিমা মুন রচিত *আমি একটি বাজ পাখিকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম* গ্রন্থের পাঠপ্রতিক্রিয়ার জন্য সেরা দশ পাঠককে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আলী যাকের-পুত্র ইরেশ যাকের বলেন, 'আজকে আমরা যে অনুষ্ঠানটি করছি, এটা একজন পাগলের জন্য করছি। কারণ আলী যাকের মনে প্রাণে একজন পাগল ছিলেন। এতো প্রতিকূলতার মধ্যে যারা দেশের আনাচেকানাচে গ্রন্থাগার করছে, তারাও আসলে পাগল। নিশাত মজুমদার যেরকম বদ্ধ উন্মাদ, আলী যাকের যেরকম বদ্ধ উন্মাদ, এখানে যারা বসে আছেন আপনারা প্রত্যেকে সেরকম বদ্ধ উন্মাদ। একটা জিনিস মনে রাখবেন– পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না। একটা সহনশীল সমাজ নির্মাণে এই পাগলামিগুলো দরকার।'

এরপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন– 'আমি কিছু দিন আগে একটা বই পড়েছি– *হাউ ইন্টারনেট ইজ কিলিং আওয়ার ব্রেইন*। এই যখন চলছে, তখন যারা বই পড়েছে– সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন। যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তাদের অভিনন্দন। বিশেষ করে তাদের পরিবারকে অভিনন্দন। কারণ পরিবারের উৎসাহ না থাকলে একটা বাচ্চা কিছুই করতে পারে না। পরিবারের উৎসাহটা অনেক অনেক বড়।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মাহমুদুল হক রচিত *জীবন আমার বোন* গ্রন্থের পাঠপ্রতিক্রিয়ার জন্য সেরা দশ পাঠককে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর বলেন, 'আলী যাকের যতো দিন বেঁচে ছিলেন তিনি নিজে একজন বাতিঘর হয়ে সমাজকে আলোকিত করেছেন। আপনারা যারা আমাদের সামনে আছেন তাদেরকে বলবো বই পড়ার এই কর্মসূচি আপনারা নিজ নিজ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে অব্যাহত রাখবেন। এটা একটা সাংস্কৃতিক লড়াই। এই জাগরণের একটা ছবি কিন্তু আজকে এই মিলনায়তনে দেখতে পাচ্ছি। এই জাগরণকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

প্রধান অতিথি শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ে আজকে আপনারা পুরস্কার গ্রহণ করলেন। আজকে আমার বহুদিনের একটা হতাশা কেটে গেল। এখন থেকে আমি জানবো নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চর্চা করে। সবাইকে অনেক অভিনন্দন। আমি আশা করবো, আলী যাকের ভাইয়ের আলো এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে বহমান থাকবে।'

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আজকে যারা বই পড়ে আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের সাথে যুক্ত হলে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। এরপর আমি যে লক্ষণীয় বিষয়টি এখানে উল্লেখ করতে চাই– তা হলো এই আয়োজনে ছেলেদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। ইদানিং মেয়েদের সংখ্যা সর্বত্র বেশি। এটা একই সাথে যেমন আনন্দের সেই সাথে উদ্বেগেরও। ছেলেদেরও তো ভালো করতে হবে। ছেলেগুলো আজকাল করছে কী! অভিভাবকেরা কি এসব নিয়ে ভাবছেন? একটা সুন্দর দেশ গড়তে গেলে তো মানবিক মানুষ লাগবে। বই পড়া মানে মনের জানালাগুলোকে খুলে দেওয়া। ছোটছোট শহরগুলোতে বসে আপনারা যারা বই পড়ার কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আপনাদের বিশেষ অভিনন্দন। আমরা সবাই মিলে কাজগুলো করলে নিশ্চয়ই সুন্দর দেশ ও মানুষ গড়ার লক্ষে সফল হবো।

অনুষ্ঠানে সূচনা সংগীত পরিবেশন করেন জাদুঘরের কর্মী প্রমিলা বিশ্বাস। অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় কামাল স্মৃতি পাঠাগার- ঢাকা, সীমান্ত গ্রন্থাগার- ঢাকা এবং অজিৎ স্মৃতি পাঠাগার- সুনামগঞ্জ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

আলী যাকের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানকারী বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ-

দনিয়া পাঠাগার, কামাল স্মৃতি পাঠাগার, তাহমিনা ইকবাল পাবলিক লাইব্রেরি, সীমান্ত গ্রন্থাগার, গ্রন্থ বিতান, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগার ও শহীদ রুমি স্মৃতি পাঠাগার।

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের সেরা ৩০ জন

স্কুল পর্যায়	কলেজ পর্যায়	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়
ফারিহা ইসলাম ঐশী	তামজিদ তাহসিন	মমতাজ আক্তার
আছিয়া আক্তার মীম	প্রযুক্তা রায়	জাকিয়া বেগম
সালসাবিল বিশ্বাস	প্রতিভা রানী দাশ	ইশরাত জাহান লিয়া
অপরাজিতা সাহা	ইহসানুল হক সিয়াম	সাদিয়া নাজনীন
সামিয়া আক্তার	জান্নাতুল ফেরদৌসী	মো: আশরাফুল ইসলাম
মিথিলা মেহেজাবিন	অনির্বাণ দাস	মায়িশা বিনতে কালাম
মাবরুকা আক্তার মিন্না	রায়মা আক্তার রিতু	মো: নিয়াজ আরেফিন
আলী আশফাক	শেখ ফাইজা	রেজওয়ানা পারভীন
রিহাম নুসাইবা বর্ণ	সিদরাতুল মুনতাহা প্রথমা	মরিয়ম আক্তার
নিলীমা খান	মোছা: নুর নাহার আক্তার নেহা	শামসি আরফিন শমি

জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

২৬ জুন ২০২৪

খ্যাতিমান কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তারা নন, তাদের একজন প্রথিতযশা কবি আরেকজন শিক্ষাবিদ, দুজনেই একটি পরিচয় বহন করেন তা হলো তাঁরা জননী। মা যেমন সন্তানকে সঠিকপথে পরিচালনা করেন তেমনি জাতির বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং সংকটকালে বাংলাদেশের জনগণকে তাঁরা সঠিক পথ দেখিয়েছেন, সামনে এসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। একজন জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল, অপরজন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। ২০ জুন জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের জন্মদিন এবং ২৬ জুন শহীদ জননী জাহানারা ইমামের প্রয়াণ দিবস। ২৬ জুন ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে এই দুই মহিয়সী নারীর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। তাদের কীর্তিগাথা বর্তমান প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেবার মধ্য দিয়ে সেই শ্রদ্ধার্ঘ পূর্ণতা পায়, আর তাই সেদিনের আয়োজনে দর্শক সারিতে অধিকাংশই ছিল নবীন শিক্ষার্থী। দুই জননীর স্নেহধন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু সবাইকে শোনালেন তাদের আজীবন সত্য ও ন্যায়ের পথে সংগ্রামের কথা। সকলকে স্বাগত জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পেছনে এই দু'জন মহত নারী অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন। সুফিয়া কামাল এবং জাহানারা ইমামের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ১৮ বছরের, কিন্তু আদর্শগত জায়গা থেকে এই দুই নারী এক হয়ে যান। বাংলা অঞ্চলের সাহসী নারীরা বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তাদের অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে চলছি। সারা যাকের স্মরণ করিয়ে দেন ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে মর্মে একটি বিবৃতিতে সুয়িয়া কামালকে স্বাক্ষর করতে বললে তিনি করেননি। আবার মুক্তিযুদ্ধের ২১ বছর পর যখন যুদ্ধাপরাধীরা দেশের শাসনক্ষমতার অংশী হয়ে ওঠে তখন গণআদালতের নেতৃত্ব দিয়ে জনগণকে সংগঠিত করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায়িত্ব নিয়েছেন জাহানারা ইমাম। বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু বলেন, এত অল্প সময়ে দু'জন মহত মানুষের বিশাল কীর্তিগাথা বলা যায় না। তিনি বলেন অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয় যে সম্ভ্রান্ত নবাব পরিবারে জন্ম নেওয়া সুফিয়া কামাল রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের ঐতিহ্য মেনে স্কুলে যাননি, অথচ তিনি উর্দু, ফার্সি এবং বাংলা তিনটি ভাষাতেই সাবলীল ছিলেন। বল্যবিবাহ, রক্ষণশীল পরিবারের বক্রদৃষ্টি সবটা উপেক্ষা করে তিনি লিখে গেছেন এবং লেখার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের স্নেহধন্য হয়েছেন। নিজেকে লেখালেখিতে আবদ্ধ করে রাখেননি, কাজ করে গেছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ নারীকে এগিয়ে আনার জন্য। প্রথম বাঙালি মুসলিম নারী হিসেবে বিমানে ভ্রমণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এটি তখন খুব সহজ কাজ ছিল না। প্রচন্ড প্রতাপশালী আইয়ুব খান ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনে নিষেধাজ্ঞা দিলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, আইয়ুব খান বাঙালি ছাত্রদের জানোয়ার বললে তিনি আইয়ূব খানকে উত্তর দিয়েছিলেন আপনি সেই জানোয়ারদের প্রেসিডেন্ট। আবার বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর প্রথম যখন প্রতিবাদ শুরু হয় সেখানে তিনি ছিলেন অগ্রণী।

জাহানারা ইমাম সম্পর্কে তিনি বলেন, কিছু অসাধারণ লেখা জাহানারা ইমাম আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তার একাত্তরের দিনগুলি পড়ে আজকের তরুণদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধকে জানতে শুরু করেছে। ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠনের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকের কোন এক সন্ধ্যায় ৭নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কাজী নুরুজ্জামানের বাসায় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হয়েছিলেন। যুদ্ধাপরাধীরা স্বাধীন বাংলাদেশে মন্ত্রী হচ্ছে বিষয়টি তারা মানতে পারেননি। সেই আসরেই প্রস্তাবিত হয় আন্দোলন এবং গণআদালতের কথা। এ কাজে জাতিকে কে নেতৃত্ব দেবে? এর উত্তরে প্রথমেই আসে কবি সুফিয়া কামালের নাম। তিনি তখন বার্ধক্যে, তিনি পরামর্শ দিলেন জাহানারা ইমামকে নেতৃত্ব দিতে, তিনি সাথে থাকবেন। জাহানারা ইমাম তখন বসবাস করছেন ক্যান্সারের সাথে , তবে একজন শহীদের মায়ের থেকে তখন তিনি অগণিত মুক্তিযোদ্ধার মা। তাদের দাবী মেনে জাতিকে বিচারহীনতার দায়মুক্তির গুরুভার তুলে নেন নিজের কাঁধে। যে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর দিকভ্রষ্ট হয়েছিল, সেই বাংলাদেশকে সঠিক দিশা দেখালেন জাহানারা ইমাম এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। একাত্তরের ২১ বছর পার করে ২৬ মার্চ ১৯৯২ গণআদালতে তিনি করলেন যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের বিচার। ট্রাকের উপর করা মঞ্চে মাইক ছাড়া যে রায় তিনি ঘোষণা করেন বিশাল জনস্রোত তা প্রতিধ্বনিত করে শেষ বিন্দুতে পৌঁছে দেয়। ১৯৯৪ সালে গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট কবি সুফিয়া কামাল তার হাতে তুলে দেন। আর তাদের এই সম্মিলিত সাহসের ফলে জাতির ইতিহাস বদলে যায়। এই জননীদ্বয় আমাদের শিখিয়ে গেছেন প্রতিবাদের ভাষা।

আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে কবি সুফিয়া কামালের কাব্যগ্রন্থ 'মোর যাদুদের সমাধি পরে' থেকে বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে স্বনন-ঢাকা, ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধে অংশনেয়া মেয়েদের উদ্দেশে লেখা তাঁর চিঠি পাঠ করেন- আবৃত্তি শিল্পী অনন্যা লাবনী পুতুল, জাহানারা ইমামের গ্রন্থ 'বিদায় দে মা, ঘুরে আসি' থেকে শ্রুতি উপস্থাপন করে মুক্তবাক, মুক্তিযুদ্ধের পরে নিখোঁজ পুত্রের সন্ধানে লেখা জাহানারা ইমামের চিঠি পাঠ করেন আবৃত্তিশিল্পী তামান্না সারোয়ার নীপা। আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

৩০ জুন ২০২৪, সকাল ১১টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন (এপিএ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সচিব জনাব ইসরাত চৌধুরী এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পক্ষে ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সতের বছর পূর্ণ করলো জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

মহান মুক্তিযুদ্ধের শোক ও গৌরবের ইতিহাস সবাইকে জানাতে কাজ করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এছাড়াও শহিদের স্মৃতি এবং স্মারক সংরক্ষণে রয়েছে অনেক বড় ভূমিকা। তারই অংশ হিসেবে মিরপুরে নির্মিত হয়েছে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ। ২০০৭ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার প্রামাণিক সাক্ষ্য বহন করে আসছে জল্লাদখানা বধ্যভূমি। স্থানীয় শহিদ পরিবারের কাছে এটি একটি পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পৈশাচিক নির্যাতন, অবাঙালিদের নারকীয়তা, শহিদ পরিবারের দুঃসহ জীবনের কথা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতার বর্ণনা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরছে শহিদ পরিবার এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

২০২৪ সালের ২১ জুন অষ্টাদশ বছরে পদার্পণ করেছে জল্লাদখানা বধ্যভূমি। এ বছর ৩০ জুন জল্লাদখানা বধ্যভূমির সামনে শিশু-বান্ধব গণপরিসর মঞ্চে আয়োজন করা হয় সপ্তদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানের। কিন্তু সকল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটায়, ফলে প্রতীকীভাবে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নির্ধারিত অতিথি নগর পরিকল্পনাবিদ সালমা এ শফি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের-এর অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কারণে তারা উপস্থিত হতে পারেননি।

উপস্থিত শহিদ পরিবার এবং বধ্যভূমির সন্তানদলের সদস্যদের নিয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম। স্মৃতিচারণ করেন শহিদ আব্দুল হাকিমের পুত্র আব্দুল হামিদ। স্মৃতিচারণে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে জল্লাদখানা সংরক্ষণের জন্য শহিদ পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপস্থিত ছিলেন শহিদ আশ্রাব আলীর কন্যা ফাতেমা বেগম, শহিদ নজরুল ইসলাম মল্লিকের ভাই ইকবাল মল্লিক, শহিদ শেখ মুকুরের পুত্রবধূ আঁখি বেগম, শহিদ শেখ জাকারিয়ার ভাই বশির আহমেদসহ অন্যান্য শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী দলসমূহের কয়েকজন সাংস্কৃতিক কর্মী। আলোচনা পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বধ্যভূমির সন্তানদল দলীয়ভাবে 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে, সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের শ্মশান করেছে কে, ধনধান্য পুষ্পভরা এবং জয় হোক জয় হোক শান্তির জয় হোক' গানগুলো পরিবেশন করে।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার,জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস (BLAST) দলের জাদুঘর পরিদর্শন

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস (BLAST)-এর মূল মন্ত্র, *ন্যায় বিচার সকলের জন্য*, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেরও লক্ষ্য সমতা-সাম্য-সম্প্রীতির সমাজ গড়ায় তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা।

গত ৪ জুলাই ২০২৪ BLAST-এর ১১জন তরুণ কর্মী ও শিক্ষানবীশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। শিক্ষানবীশদের চারজন ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও আইন বিভাগের শিক্ষার্থী। তারা তিনমাস BLAST-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে অবস্থান করবে। পরিদর্শন শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বীরাঙ্গনা নারীদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী, গর্ভপাত ও যুদ্ধশিশুদের দত্তক বিষয়ে অবহিত করেন, পাশাপাশি তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পটভূমি, যাত্রাপথে নানান প্রতিবন্ধকতা ও সর্বসাধারণের সহযোগিতা ব্যক্তি-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরের জনগণের জাদুঘর হয়ে ওঠার কথা তুলে ধরেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন

নাসেহুন আমীন তার দীর্ঘ ৩২ বছরের অধিক বর্ণিল কর্মজীবনে সমৃদ্ধ হয়েছেন নানাবিধ অভিজ্ঞতায়। তার বিশেষায়িত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে External Audit, Accounting & Finance, Administration and Supply Chain Management। বিগত ১৬ বছর তিনি DBL Group-এর Head of Procurement (Supply Chain Management) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশাগত জীবনে একজন দক্ষ কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব নাসেহুন আমীন ব্যক্তি জীবনে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে তিনি বাংলাদেশ বেতারের শিশু-শিল্পী হিসেবে যুক্ত হন এবং পরে তিনি ছায়ানট থেকে সেতার শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি বর্তমানে ছায়ানটের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, পাশাপাশি তিনি জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ-এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য। তার সাংগঠনিক কর্মকান্ডের হাতেখড়ি ঘটে ওয়াহিদুল হক প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন আনন্দধ্বনি-তে যুক্ত হবার মধ্য দিয়ে। মননে বাঙালিত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে এবং দীর্ঘ পেশাগত দক্ষতা দিয়ে ভবিষ্যতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে আরো সমৃদ্ধ করবেন বলে আশা করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে তার পথচলা আনন্দময় হোক, বর্ণাঢ্য হোক।

পায়রাবন্দ থেকে উলানবাটোর

‘সুলতানার স্বপ্ন’র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি উদযাপন

বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত, সমাজ সংস্কারক ও লেখক রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের লেখা “সুলতানা’জ ড্রিম” এক ধ্রুপদী কল্পকাহিনী। গত ৮ মে ২০২৪ মানবের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সভায় ‘বিশ্বস্মৃতি’ বা ‘মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড’-এর আঞ্চলিক রেজিস্ট্রারে স্থান পেয়েছে “সুলতানা’জ ড্রিম”। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদত্ত প্রস্তাবনার এই স্বীকৃতিতে বাংলাদেশের সকলেই আনন্দিত। এই অসামান্য অর্জনকে উদযাপন করার উদ্দেশে গত ৬ জুলাই ২০২৪ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে এবং ইউনেস্কো ঢাকা দপ্তরের সহযোগিতায় রংপুরের পায়রাবন্দে ‘বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্রে’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মণি-শংকর স্মৃতি পাঠাগারের একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মী অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়ন করেন। অনুষ্ঠানে রংপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ‘সুলতানার স্বপ্ন এবং আমার ভাবনা’ শীর্ষক সৃজনশীল পাঠ প্রতিক্রিয়া কর্মসূচির বিজয়ীদের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের ভাবনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

রোকেয়া-স্তম্ভের সামনে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নারী জাগরণের অগ্রদূতকে সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন আয়োজক এবং অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি, মো: জাকির হোসেন এমপি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর, ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রোগ্রাম অফিসার নূরে জান্নাত প্রমা এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

আষাঢ়ের এই বৃষ্টিমুখর দিনেও অডিটোরিয়ামে তিলধারণের জায়গা ছিল না। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাসহ নানা বয়সী মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। ‘সুলতানার স্বপ্ন এবং আমার ভাবনা’ শীর্ষক সৃজনশীল পাঠ প্রতিক্রিয়া কর্মসূচিতে প্রাপ্ত চার শতাধিক পাঠ প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে সেরা

পাঠ প্রতিক্রিয়া বাছাই করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মোট তিনটি ক্যাটাগরিতে ১১ জনকে পুরস্কার এবং অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে ইউনেস্কোর লোগো সম্বলিত সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান সফল করতে স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিজন ও সমাজকর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ‘সুলতানার স্বপ্ন-র’ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি উদযাপন পরিষদ। রাশেদ মাহবুব রব্বানকে সভাপতি এবং মোসাদ্দেক ইসলামকে সদস্য সচিব করে গঠিত কমিটি স্বল্পসময়ে মিঠামাইন উপজেলা ও রংপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠের আয়োজন করে। গোটা কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে রোকেয়ার জন্মভিটায় রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র বহুদিন পর প্রাণের আনন্দে জেগে উঠেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর বলেন, রোকেয়া আমাদের জন্য যা করতে চেয়েছিলেন তার বাস্তবরূপ আমাদের সামনেই আছে। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত আজকে নারীদের জয়জয়াকার। ‘সুলতানার স্বপ্ন এবং আমার ভাবনা’ শীর্ষক পাঠ প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও মেয়ে পাঠকের সংখ্যা বেশি। নারীরা কর্মস্থলেও অধিক সততা এবং নিষ্ঠার সাথে কর্মপরিচালনা করে থাকে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, তাদের পিছনে রেখে দেশকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব না। এজন্য নারীপুরুষ নির্বিশেষে কাজ করে যেতে হবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর বলেন, ১১৯ বছর আগে রংপুরের এই পায়রাবন্দের এক মেয়ে লিখেছিলেন ‘সুলতানার স্বপ্ন’ যিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত একজন মানুষ যাঁর সুযোগ হয়নি স্কুল, কলেজ, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার। একজন অবরোধবাসিনী হয়েও তিনি হয়েছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত। তাঁর লেখা সুলতানার স্বপ্নে আছে নারীবাদী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ, আছে বিজ্ঞান ও পরিবেশ প্রসঙ্গ যা আসলেই দারুণ বিস্ময়কর।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, সুলতানার স্বপ্নের যে বার্তা এটা নতুন প্রজন্মের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আরও গভীরভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। স্কুল থেকে কলেজ পর্যায়ে যেতে যেতে অনেক মেয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে। বাল্যবিবাহ এখনও রংপুরে একটা বড় সমস্যা। এজন্য সমাজের সকলকে সম্মিলিতভাবে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। তখন সুলতানার স্বপ্নে নারীরা স্থির করেছিল একুশ বছরের আগে তারা বিয়ে করবে না। তারা শিক্ষিত হবে। রোকেয়ার ‘সুলতার স্বপ্ন’-এর ইউনেস্কো স্বীকৃতিতে গর্বিত রংপুরবাসীর ওপর তাই দায়িত্ব বর্তায় রোকেয়ার এই প্রত্যাশা পূরণ, রংপুরে বাল্যবিবাহ রোধ। ‘সুলতানার স্বপ্ন পাঠ ও স্বপ্ন পূরনের চেষ্টা তাই হাতে হাত ধরে চলবে।

ইয়াছমিন লিসা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

যারা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন তাদের প্রতি রইল আমার স্বশ্রদ্ধ সালাম। এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন প্রজন্মকে পরিদর্শন করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। কারণ বর্তমান প্রজন্ম ও নবাগত প্রজন্ম বাংলাদেশ কীভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে তা কিছুটা হলেও বিস্তারিত জানতে পারবে। ফলে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হবে ও দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা রক্ষার মূল্যবোধ ও চেতনাকে ধারণ করতে পারবে।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

ডা. গাজী মোহাম্মদ একে আজাদ
২১/৬/২০২৪

বাংলাদেশ-এর জন্ম কখনোই সহজ ছিল না। এটুকু জানতে হলেও এই জাদুঘরে আসাটা জরুরি।

তানজিল আহমেদ
২৫/৬/২০২৪

আমি মো: এমরানজাহান। প্রফেসর ইতিহাস বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। আজ আমি এবং আমার সঙ্গে আসা গবেষক মাহজুবা হক জাদুঘরে এসে কাজ করলাম দীর্ঘ সময়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ‘মুক্তিযুদ্ধে নারী’র তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ করা। বেশ কিছু পেয়েছি। কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। নারীর তথ্য-উপাত্ত আরও অনেক কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেশের নানান জায়গায়। এগুলো সংগ্রহ করে শুধু নারী বিষয়ক ডকুমেন্টস দিয়ে আলাদা একটি গ্যালারি করার জন্য সম্মানিত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা জানি মুক্তিযুদ্ধে নারীর বহুমুখী ভূমিকা ছিল। শুধু সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, প্রতিটি ক্ষেতে নারীর ত্যাগ ছিল অবর্ণনীয়। গ্যালারিতে এসব চিত্র বিন্যাস করে সাজানো উচিৎ। অতি অল্প তথ্যই আমরা পেয়েছি। কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই এরূপ জাতীয় ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য।

এমরানজাহান
২৬/৬/২০২৪

রংপুর ও নাগেশ্বরীর নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মাঝে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

রংপুর জেলার সদরসহ পাঁচ উপজেলা ও নাগেশ্বরী উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মে-জুন ২০২৪ মাসে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) ও গংগাচড়া উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি সম্পর্কে খুব আন্তরিক ছিলেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় পরিচালিত এই শিক্ষা কর্মসূচি বিষয়ে গংগাচড়া উপজেলার একাডেমিক সুপার ভাইজার মো. আমজাদ হোসেন বলেন, নবীন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি কিন্তু তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জেনেছে পাঠ্যবই এবং জাতীয় দিবসগুলো থেকে। আজ নবীন-নবীনারা ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে জানতে পারবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস। বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতি গঠনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এ মহতি উদ্যোগ অনেক গুরুত্ব বহন করে।

মুক্তিযুদ্ধে রংপুর জেলা ও নাগেশ্বরী উপজেলা ছিল ৬ নম্বর সেক্টরের অধীনে। রংপুর জেলায় মুক্তিযুদ্ধের বেশ গৌরবজনক ইতিহাস রয়েছে। ইয়াহিয়া খানের কূটকৌশলের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ২ মার্চ এবং সারা দেশে ৩ মার্চ হরতাল ডাকেন। হরতাল সফল করতে ২ মার্চ রাতে জেলার তৎকালীন সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাঙ্গা হাউসে (বর্তমানে গ্রামীণ টাওয়ার) সভা ডাকেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাছারি বাজারে দলমত নির্বিশেষে জমায়েত হয়ে মিছিল বের হওয়ার পর আস্তে আস্তে বিশাল মিছিলে রূপ নেয়। সেই মিছিলে রফিকুল ইসলাম গোলাপ, সিদ্দিক হোসেন, মমতাজ জাকির, শেখ আমজাদ হোসেন, নুরুল হক, অলক সরকার, জায়েদুল আলম, মোফাজ্জল হোসেনসহ হাজারো বীর জনতা অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি তেঁতুলতলায় (বর্তমান শাপলা চত্বর) পৌঁছালে কারমাইকেল কলেজ থেকে আরেকটি মিছিল যোগ দেয়। মিছিল রেলস্টেশন হয়ে ফিরে আসার পথে চোখে পড়ে বর্তমান ঘোড়াপীর মাজারের সামনে অবাঙালি সফররাজ খানের বাসার উপর উর্দুতে লেখা সাইনবোর্ড। তা নামাতে মিছিল থেকে এগিয়ে যান কৈলাশ রঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র শংকু সমাঝদার, মকবুল হোসেন শরীফুলসহ আরো অনেকে। ঠিক তখনই ঐ বাসা থেকে চালানো গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শংকু সমাঝদার ও মকবুল হোসেন শরীফুল। শংকুর মৃত্যুসংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লে গোটা শহর এক ভয়াল শহরে রূপ নেয় এবং উত্তাল হয়ে উঠে রাজপথ। মূলত ৩ মার্চের ঘটনার মধ্য দিয়ে রংপুরে মুক্তিযুদ্ধের সুচনা হয়। ২৮ মার্চ রোববার রংপুর আবার জেগে উঠেছিল এক নবচেতনায়। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ লাঠি, তীর ধনুক, বল্লম, দা, কুড়াল ইত্যাদি সহযোগে বেলা তিনটার দিকে রংপুর ক্যান্টমেন্ট আক্রমণ করে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানি সৈনরা বিক্ষুব্ধ জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শহরে পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র ছিল রংপুর টাউন হল। ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে তিস্তাব্রিজে মুক্তিবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। ১৬ ডিসেম্বর রংপুর শহর ও শহরতলীতে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়। ১৭ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে রংপুর জেলা শত্রুমুক্ত হয়।

রংপুর জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি চলাকালীন সুহৃদ মো. আকতারুর জামান (স্যান্ডো) স্মৃতিচারণে বলেন, বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মকবুল হোসেনের কাছে শুনেছেন বঙ্গবন্ধু রংপুরে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন। ১৯৫৬-এ ৯ অক্টোবর রংপুর আসনের উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী এড. নুরুল হকের সমর্থনে রংপুর আর্টস কাউন্সিল (বর্তমানে টাউন হল)-এ এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন। ১৯৬৪-এর ৩ মে তৎকালী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ-এর সাথে বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন এবং পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সমাবেশে বক্তৃতা করেন। ১৯৬৮-৬৯-এ তাজউদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এবং রংপুরে আসলে লোকমান হোসেন কন্ট্রাক্টরের উইলিস জিপ গাড়ি দিয়ে নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। ১৯৬৯-এর মাঝামাঝি সময়ে সামরিক শাসনের কিছু ধারা স্থগিত হলে সাংগঠনিক সফরে তিনি রংপুরে আসেন। এ সময় কেন্দ্রীয় নেতা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রউফ সফরসঙ্গী ছিলেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে এড. নুরুল হক, আজিজুর রহমান, ডাক্তার সোলায়মান মন্ডল, মজিবর মাস্টার, সিদ্দিক হোসেনসহ অনান্যরা। বঙ্গবন্ধু রংপুরে আসলে অধিকাংশ সময় রাত্রী যাপন করেছেন শহরের পুরাতন ডাক বাংলোর ১০১ নম্বর কক্ষে।

১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে জনসংযোগ করার জন্য ঠাকুরগাঁও থেকে পার্বতীপুর হয়ে এবং ফুলবাড়িঘাট থেকে কাউনিয়া হয়ে দুই দফা ট্রেন যাত্রা করে রংপুরে আসেন। এ সময়ে তিনি হ্যান্ডমাইকে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করেছিলেন। ১০ মার্চ ১৯৭০ রংপুর কালেক্টরেট ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা দেন। এই জনসভাটি ছিল রংপুরে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা। নিসবেতগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের সময় শেখ খয়রুল আলম (দুখু)-এর কাছ থেকে জানতে পারি ১৯৬৯-এ বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সাংগঠনিক সফরে রংপুর আসেন এবং স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা শেখ আমজাদ হোসেনের অনুরোধে বদরগঞ্জ থানার সফর বাতিল করে নিসবেতগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জনসভা করেন।

'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ' শিক্ষা কর্মসূচি ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনীর মাধ্যমে রংপুর জেলার সদরসহ ৫ উপজেলা ও নাগেশ্বরী উপজেলায় ২৭ দিনে ২২ কার্যদিবসে ৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩০,০২৫ জন এবং ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩,২৭৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এ কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন ৪৬ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক। এছাড়া শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ৮টি উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে ১৬,৮০০ জন সাধারণ দর্শনার্থী ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে।

রঞ্জন কুমার সিংহ
কর্মসূচি কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম শিল্পীসংস্থার সদস্য এনামুল হক

পুরনো ঢাকার বেগম বাজারে আমার জন্ম বেড়ে ওঠা। ভাষা আন্দোলনের সময় জেলখানা এলাকায় শ্লোগান হতো। আমার আব্বা শ্লোগানগুলোর অর্থ বুঝিয়ে বলতেন। আব্বা আমাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশে নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে বই কিনতে নিয়ে যেতেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় আব্বার সাথে আমি ভোট দেখতে গিয়েছিলাম। উর্দু রোড থেকে ওয়াহিদুল হকরা আমাদের বাসায় আসতেন। আমি তাকে বর্দা বলে ডাকতাম। ১৯৬৬-তে শিক্ষা আন্দোলনে আমি সক্রিয় ছিলাম। ১৯৬৪ দাঙ্গার সময় নওয়াবপুর রোডে বর্দাকে দেখেছি লাঠি হাতে দাঙ্গা প্রতিরোধে বিহারিদের ঠেকাতে রাস্তায় নেমেছেন। আমিও ছিলাম সেখানে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় যেদিন আসাদ আমার গেলো সেদিন আমি ছিলাম মিছিলে। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের ভাষণ রেসকোর্স ময়দানে বসে শুনলাম। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের সময় আমি হল থেকে বাসায় এসে ঘুমিয়ে গেছি। ২৬ মার্চের পরে আমি এবং বন্ধু হাফিজুল্লাহ সাভারের উদ্দেশে রওনা দিলাম কিন্তু পাকবাহিনী গাবতলী ব্রিজের ওখানে বাসের সবাইকে নামিয়ে হত্যা করলো সৌভাগ্যক্রমে আমি এবং হফিজ বেঁচে গেলাম। আমরা ফিরে এলাম বাড়িতে। এপ্রিলের শেষ অথবা মে মাসের শুরুতে ওয়াহিদুল হকের সাথে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ঢাকা থেকে দাউদকান্দি হয়ে আমরা ধর্মনগর গিয়ে পৌঁছলাম। দেখা হলো সুলতানা কামাল, তাঁর বোন টুলু, মিনু বিল্লাহর সাথে। আগরতলা এসে চিত্রশিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর সাথে দেখা হলো। হাফিজ চলে গেলো মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ে। ওয়াহিদুল হকের সাথে আমি গানের দল গঠনের উদ্দেশে কলকাতায় রওনা দিলাম। তিন দিন ট্রেনে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা আগরতলা থেকে কলকাতায় শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছলাম। তরু, ফ্লোরা, বুলা, বুলার মা ও ভাইসহ আমরা উঠলাম লেলিন স্কুল নামে একটা জায়গায়। এক সময়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার উল্টো দিকের সিআইটু রোডের বাসায় থাকতেন ইলা মিত্র। আমার অসুস্থতা দেখে তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। পরীক্ষায় টাইফয়েড ধরা পড়লে রমেন মিত্র আমাকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। ২৯ দিন পর আবার লেলিন স্কুলে ফিরলাম। সেখান থেকে বেনু আমাকে ৭ মার্চের ভাষণ গ্রাহক খায়ের সাহেবের ভাড়া করা বাসায় নিলু আপার কাছে নিয়ে আসলো। এই বাসাতে আমিসহ অনেক শব্দ সৈনিক খোকা, খাইরুল আলম শাকিল, শাকিলের ছোট ভাই সোহেল, বাদল রহমান, মোস্তফা মনোয়ার মন্টু, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী আরও অনেকে থাকতেন। তারিক আর আমি এক রুমে থ াকতাম। ওখান থেকেই ১৪৪ লেলিন সরনীতে আমরা রিহার্সেলে যেতাম। বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গান গাইতে যাওয়া শুরু করলাম। মুক্তাঞ্চলেও যেতাম। আমরা প্রথম অনুষ্ঠান করলাম 'রূপান্তরের গান' রবীন্দ্র সদন কলকাতায়। গীতি আলেখ্যটি সংকলন করেছিলেন শাহরিয়ার কবির। দিল্লী থেকে আমাদের আমন্ত্রণ এলো। রাজধানী এক্সপ্রেসে করে গেলাম। আমরা দিনে ১৫ থেকে ২০টা করে জায়গায় গান করতাম। একদিন চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক এলেন। তিনি জানালেন কল্পনা দি (বিপ্লবী কল্পনা দত্ত) তোমাগো গান শুনতে চাইছেন। ঋত্বিক দা আমাদের কল্পনা দি'র বাড়ি নিয়ে গেলেন। কল্পনা দি একটা গান শুনতেন আর সেই গানের সূত্র ধরে মাস্টার দা সূর্যসেনের গল্প বলতেন। ফিরে আসলাম কলকাতায় আবার। এখানে সেখানে গান গাইতে থাকলাম। মাঝে একবার শান্তি নিকেতন গিয়েছিলাম গান গাইতে। ওরা খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল আমাদের গান শুনে। একটা পর্যায়ে মার্কিন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা লেয়ার লেভিন এলেন। আমাদের নেতা ছিলেন ওয়াহিদুল হক ও সন্‌জীদা খাতুন। ওনারাও মানা করলেন। আমি আর ওই দলে গেলাম না। আমরা তখন বিজয়ের দ্বার প্রান্তে। ভারত ও ভুটান আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হলো। আমাদের ঢাকা ফিরতে দেরি হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: **শরীফ রেজা মাহমুদ**

গণহত্যা ও ন্যায় অধ্যায়ন কেন্দ্রে সম্পৃক্ত হলো শিক্ষানবীশ তরুনেরা

'সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস' তাদের কাজের মধ্য দয়ে দিন দিন আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। এই অর্জনের পেছনে যেমন রয়েছে বিজ্ঞ মানুষের অবদান, পাশাপাশি রয়েছে কিছু তরুণ স্বেচ্ছাসেবীর নিরলস শ্রম। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ই মে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস একটি ইন্টার্নশিপের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

শিক্ষানবীশ হিসেবে আবেদনের জন্য স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত বা সদ্য স্নাতক পাস করা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষানবীশদের কাজের পাঁচটি ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়, এগুলো হচ্ছে ফিল্ড রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন ও ট্রান্সক্রিপশন, গ্রাফিক ডিজাইন ও আইটি সহায়ক, প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এবং কনটেন্ট ক্রিয়েশন। ১০৫ জন তরুণ শিক্ষানবীশ হিসেবে যুক্ত হতে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন করেন, প্রাথমিক বাছাই শেষে ২৭ জনকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয় পরবর্তী যাচাই-বাছাইয়ের জন্য। গত ২৮ জুন ২৭ জনকে নিয়ে একটি মূল্যায়ন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়ন পর্বে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাছাইকৃতদের কর্মক্ষমতা, পারদর্শিতা, ধীশক্তি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। এরই মাধ্যমে সেখান থেকে চুড়ান্তভাবে ১৫ জনকে নির্বাচিত করা হয় এবং সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস দ্বারা এই ১৫ জনকে চুড়ান্ত ইন্টার্ন হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইন্টার্নিশিপটির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে পরিচিত করানো এবং এর মাধ্যমে একটি সখ্যতা গড়ে তোলা ইতিহাস ও নতুন প্রজন্মের মাঝে। এর পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের নতুন চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, মনোভাব, দর্শনকে কাজে লাগিয়ে জাদুঘরকে আরও যুগোপযোগী করে তোলা এবং জাদুঘরের সাথে সর্বস্তরের মানুষের মেলবন্ধন সৃষ্টি করা। এই প্রথমবার সিএসজিজে তাদের কাজের জন্য কিছু তরুণ ইন্টার্ন নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্তটি একটি সুদূরপ্রসারি চিন্তা ভাবনার ফল। পাশাপাশি আবেদনকারীর সংখ্যা থেকে অনুমান করা যায় যে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে এবং এ বিষয়ে কাজ করতেও তারা আগ্রহী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অজানা তথ্য নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে এই গবেষণা কেন্দ্র। তারই ধারাবাহিকতায় একটি গবেষণা সার্ভে করা হবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক খুব কম তথ্য এসেছে। সেই সার্ভের উদ্দেশে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করার জন্য এসব তরুণদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কাজ করার পূর্বে যে ধারণা এবং জ্ঞান থাকা আবশ্যক তার জন্য ডকুমেন্টেশন এবং ট্রান্সক্রিপশন ক্যাটাগরিতে মেধাবী তরুণদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ইন্টার্নরা ব্যস্ত সময় পার করছে জাদুঘরের আঙিনায় এবং নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের জ্ঞানে আলোকিত করছে। ইন্টার্নশিপ ৩ মাসব্যাপী চলমান থ াকবে এবং শেষ হলে সকল প্রার্থীকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হবে। তাছাড়া পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে রিকমেন্ডেশন লেটারও প্রদান করা হবে। এই ইন্টার্নশিপে যারা সুযোগ পেয়েছেন তারা সবাই কমবেশি সদ্য গ্রাজুয়েট অথবা অনার্স ফাইনাল বর্ষের শিক্ষার্থী। তাই আশা করা যায় যে তারা সকলেই তরুণ হৃদয়ের প্রতিফলন তাদের কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন এবং এর মাধ্যমে সিএসজিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবেন।

শিক্ষার্থীদের পাঠানো প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য

শিশুটি এখনও বেঁচে আছে

জ- ২০৭৫৪

আমি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আমার নানুর কাছ থেকে শুনেছি। তা হলো, আমার নানুর বাড়িটি ছিল বাজিতপুর-এর পয়লানপুর গ্রামে। একদিন সেই গ্রামে পাকিস্তানিরা এসে হামলা দিল। এই ভয়ে গ্রামের সকল মানুষ পালাতে থাকে। কিন্তু আমার আম্মার চাচা ও চাচি সেই গ্রামেই থেকে যায়। আমার নানু যখন বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছিল তখন মনের ভুলে আমার খালাম্মাকে ঘরে রেখেই চলে গিয়েছিল। তখন আমার খালাম্মা ঘুমিয়ে আছিল। আমার নানু যখন একটি মাঠের মাঝে যায় তখন আমার খালাম্মার কথা মনে পড়ে তার। তারপর নানু অনেক কষ্টে আবার বাড়িতে এসে খালাম্মাকে নিয়ে যায়। তখন খালাম্মা খুব ছোট ছিল।

সেই দিনটা ছিল সোমবার। সেই রাতেই আমার নানুর বাড়িতে হামলা দেয় পাকিস্তানিরা। আমার নানুর বাড়িতে দুটি ঘর ছিল। সেই দুটি ঘর পাকিস্তানিরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ঘরের ভিতরের সকল জিনিস ও কাপড় চোপড় পুড়ে গিয়েছিল। এতে আমার নানু অনেক মর্মাহত হয়েছিল। সেই দিন রাতে আমার আম্মার চাচা মুছা মিয়ার ঘরও পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তানিরা আমার আম্মার চাচা ও চাচি এবং তাদের ছোট পুত্র শিশুকে ধরে তাদের ঘরটিতে বন্দি করে। তারপর পাকিস্তানিরা তাদেরকেসহ ঘরটির মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন আমার আম্মার চাচা ও চাচি ঘরটির মধ্যে চিৎকার করতে থাকে। হঠাৎ আমার আম্মার চাচার মাথায় একটি বুদ্ধি আসে। তিনি ঘরের একটি জানালা খুলে তার ছোট শিশু পুত্রকে ফেলে দেয়। বাচ্চাটিকে ফেলে দেওয়ার পর পাকিস্তানিরা বাচ্চাটিকে দেখতে পায়নি। আর আমার আম্মার চাচা ও চাচি সেই ঘরটির মধ্যেই পুড়ে মারা যায়। আমার আম্মার চাচির বোন রেহেনা বেগম মুছার পুত্রটিকে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করে বড় করেছেন। সেই ছোট শিশুটি এখনও বেঁচে আছে। তার নাম মো. মঞ্জু ভুইয়া। তার জীবনে এটি খুব করুণ কাহিনি ছিল।

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মোছা. ঝুমা আক্তার	**মোছা. মুর্তুজা বেগম**
মুছামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৬৫, সম্পর্ক : নানু
৯ম শ্রেণি, বিজ্ঞান, রোল নং : ৫০	

বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২৩

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রদান করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। ডা. সারওয়ার আলী তার সূচনা বক্তব্যে বলেন, 'এ অঞ্চল সাহসী ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের আমলে এখানকার সাংবাদিকবৃন্দ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলনে বিশাল সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন এবং দেশকে মুক্তিযুদ্ধের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের পথরেখা ধরে এই ধারাকে অগ্রসর করেছেন ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা বজলুর রহমান। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং সেসময় পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা পরবর্তী সময়ের সামরিক সরকার আমলে সাংবাদিকতাকে অবলম্বন করে তিনি গণতন্ত্রের সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই প্রথিতযশা সাংবাদিকের মতো আজও যারা সামাজিক মাধ্যমের দাপটের যুগেও নির্ভীক এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা অব্যাহত রেখেছেন আমরা তাদেরকেও সাধুবাদ জানাচ্ছি। আজ এই পদক বিতরণের ষোলতম আয়োজন। এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় যে সকল সাংবাদিক ও জুরিবোর্ড সদস্য আমাদের সাথে ছিলেন তাঁদের সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' এরপর জুরিবোর্ড সদস্য ফরিদুর রেজা সাগর কর্তৃক প্রিন্ট মিডিয়ায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিবেদকের নাম ঘোষণা করেন। যুগ্মভাবে এই পদক পায় দৈনিক ভোরের কাগজের ডেপুটি চিফ রিপোর্টার ঝর্ণা মনি ও ডেইলি স্টার পত্রির রিপোর্টার আহমেদ ইশতিয়াক। জুরিবোর্ড সদস্য এ এস এম শামসুল আরেফিন কর্তৃক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিবেদকের নাম ঘোষিত হয়। এককভাবে এই পদক পায় চ্যানেল আই-এর স্টাফ করসপন্ডেন্ট লায়লা নওশিন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য এই পদক লাভ করেন। পুরস্কার প্রাপ্তদের পদক বিতরণ শেষে অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সভাপতির বক্তব্য বলেন, 'আজকে যে তিনজন বজলুর রহমান স্মৃতি পদকে ভূষিত হলেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। একই সাথে জুরিবোর্ড সদস্যেদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সাংবাদিক বজলুর রহমান তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি দৈনিক সংবাদের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। অন্য অনেক লাভবান পেশার হাতছানি ত্যাগ করে তিনি বেছে নিয়েছেন সাংবাদিকতার পেশা। সারা জীবন তিনি মানুষের মুক্তি ও কল্যাণে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। নতুন প্রজন্মের সামনে তিনি সাংবাদিকতার উজ্জ্বল নমুনা স্থাপন করে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতা মুক্তিযুদ্ধের চর্চাকে সবসময় জীবন্ত রাখবে। এবং সেই কারণেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতাকে মূল্যায়ন করতে বজলুর রহমান স্মৃতিপদক দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, দর্শন, ধারনা ও চেতনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াকে উৎসাহিত করাই এই স্মৃতি পদকের পেছনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আমি আগত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।'

ট্রাস্টি মফিদুল হক তার ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তৃতায় বলেন, 'বিগত ষোল বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক অনুষ্ঠানের একটি বড় রকম ঘটনা হয়ে আছে। বজলুর রহমান প্রতিবছর ছায়া হয়ে ফিরে আসেন এই অনুষ্ঠানে। মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরেও নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের মাধ্যমে যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা অব্যাহত থাকে সেটা আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও প্রত্যাশার মাত্রা মেলে ধরে। আমরা একই সাথে চাই এই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতা যেনো ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আরও গুরুত্ব ও গভীরতা পায়। আমরা আমাদের অতীতের সুকৃতি এবং যারা অবদান রেখে গেছেন তাদের স্মরণের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে চাই ভবিষ্যৎকে নির্মাণের লক্ষ্যে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এখানে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে মাত্র। এই ভূমিকাকে সার্থক করতে আপনাদের নানা রকমের সহযোগিতা রয়েছে। আমাদের সকলের যে আকাংক্ষা– এই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে বহন করে নিয়ে যাবে এবং বিশ্বের বুকে একটা মর্যাদাপূর্ণ জাতি হিসেবে উদাহরণ তৈরি করবে। এই ক্ষেত্রে আজকের নবীন প্রজন্ম বিশেষ করে সাংবাদিকরা ভূমিকা পালন করবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে থেকে সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ওবায়েদুল হাসান প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, 'আমি যখনই সুযোগ পাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসার চেষ্টা করি। কারণ আমি মনে করি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো অনন্তকাল ধরে বাংলাদেশকে পথ দেখিয়ে যাবে। জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ অর্জন গোটা বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতি পদক প্রদান অনুষ্ঠানে আমাকে অতিথি করায় আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞা জানাচ্ছি। সাথে সাথে প্রবাদ প্রতিম সাংবাদিক বজলুর রহমানের স্মৃতির প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। নিখাদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর এ অমর ব্যক্তিত্ব তাঁর বহুধা বিস্তৃত কর্ম ও অবদানে আমাদের কৃ তার্থ করে গেছেন। আমি আরও স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা পালনকারি এম আর আকতার মুকুল, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী ও কামাল লোহানীকে। একই সাথে গভীরভাবে স্মরণ করতে চাই মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সাংবাদিকদের মধ্যে শহীদুল্লাহ কায়সার, সেলিনা হোসেন, শহীদ সাবের ও সিরাজুদ্দীন আহমেদকে। আমি বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকদের অনুরোধ করবো, তারা যেনো এই সকল দিকপাল মানুষদের আদর্শ তাদের পেশাগত জীবনে গ্রহণ করে। আজ যারা পদক প্রাপ্ত হলেন তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।' অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থপক রফিকুল ইসলাম।

প্রতিবেদন: শরীফ রেজা মাহমুদ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official